ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN 2582-0427 (Online)
Volume 1, Number 1
March 2019
http://www.ensembledrms.in

বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ ঃ পুরাণের নবরূপায়ণ

(BUDDHADEV BASUR ‘TAPASWI O TARANGINEE’: PURANER NABORUPAYAN)

Ghanashyam Roy[1]✉

প্রবন্ধ নির্দেশক সংখ্যাঃ
১৮১২২১০৯ এন ১ বি এন জি ওয়াই

প্রবন্ধ সংক্রান্ত নথিঃ
জমা - ২১শে ডিসেম্বর ২০১৮
গ্রহণ - ২২শে জানুয়ারি ২০১৯
বৈদ্যুতিন প্রকাশ - ২৩শে জানুয়ারি ২০১৯

সূচকশব্দঃ
অন্তঃপ্রেরণা, দেশীয় ঐতিহ্য, লোক ঐতিহ্য, রামায়ণ-মহাভারত, ঋষ্যশৃঙ্গ, মনস্তত্ত্ব , মিথ

সারসংক্ষেপঃ
সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সাহিত্যও পরিবর্তীত কালের পদচিহ্নে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; নতুন যুগের প্রয়োজনে পুরাতন সময় ও সমাজ নতুরূপে ধরা দেয় শিল্পীর কাছে। শিল্পী-সাহিত্যিকের এই অন্তঃপ্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনিবার্য হলেও সামাজিক সত্তার অংশরূপে স্রষ্টা সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, আর্তি-বেদনাকে ধারণ করেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে তাই দেখি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে উদ্দীপিত শিল্পী-সাহিত্যিকগণ নানাভাবে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য ও লোক ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক কাব্য-জগতে বিদ্রোহের জন্মদাতা বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় ঐতিহ্য ও লোক ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ কাব্য-নাটকে। এই নাটক রচনার অন্তঃপ্রেরণা তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’ কবিতা থেকে গ্রহণ করলেও এই নাটকে তিনি রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ সম্পর্কিত ভারতীয় মিথটিকে কেন্দ্র করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুণির মিথটিকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার পটভূমিকায় চিত্রায়িত করেছেন তাঁর নিজস্ব পাঠ দিয়ে। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকের ভূমিকা অংশে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন - ‘‘এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পীত-- অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো ক’রে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব-বেদনা।..... আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হ’য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদের সমকালীন; ....’’ বর্তমান বিশ্বের বহুমাত্রিক মানুষের দ্বন্দ্ব-মানসতা ঋষ্যশৃঙ্গ মিথটিকে অবলম্বন করে কীভাবে নবরূপায়িত হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে তা আমাদের অন্বিষ্ট।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-’৭৪) এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি যে শুধু আধুনিক কাব্য-জগতে বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিলেন তাই-ই নয়, সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই তিনি অবলীলায় বিচরণ করে অনায়াসসিদ্ধ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি এক ভিন্ন ধারার সৃষ্টি করেছেন। নাট্য সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করার ব্রতী হয়ে তিনি রচনা করলেন তাঁর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ (১৯৬৬) নাটকটি। এই নাটকটি সম্পর্কে তিনি যখন প্রথম ভাবেন তখন তিনি উত্তর-

[1] [First Author] ✉[Corresponding Author] Assistant Professor in Bengali, Dr. Meghnad Saha College, Itahar, Uttar Dinajpur, West Bengal, INDIA; Email: *ghanashyamroy24@gmail.com*

© Dr. Meghnad Saha College (www.drmscollege.ac.in)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

তিরিশ এবং নাটকটি রচিত হয় বুদ্ধদেবের বয়স আটান্ন বছর বয়সে। জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে জগৎ ও জীবনের বহুমুখী সংস্থানকে রূপায়িত করার জন্যই তিনি ভারতীয় ঋষ্যশৃঙ্গ সম্পর্কিত মিথটিকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার পটভূমিকায় এই নাটকে চিত্রায়িত করেছেন।

রামায়ণ-মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গের ঘটনাটিই এই নাটকের মুখ্য অবলম্বন। যদিও রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'(১৮৯৭) কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুকে ছেলেবেলায় অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। এরপরে 'কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত'-এ ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী পড়ে তিনি চমকে ওঠেন। মহাভারতের 'বন' পর্বে বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে লোমশ মুনি বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের কথা বলেছেন। অঙ্গদেশে অনাবৃষ্টির কারণে সুচতুরা বারাঙ্গনাদের সাহায্যে আজন্ম তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে অঙ্গদেশে আনা হয় এবং নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গদেশে বৃষ্টি শুরু হয়। এর পর রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং সন্তান জন্মের পর দু'জনই রাজধানী ত্যাগ করে আশ্রমে ফিরে যান। উল্লেখ্য, রামায়ণের 'বাল' কাণ্ডে মন্ত্রী সুমন্ত্রের কাছেও রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের যে কাহিনী শুনেছিলেন, তা মহাভারতেরই অনুরূপ। আর, রামায়ণ ও মহাভারত এই দু'টি গ্রন্থেই মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মের কথা বলা হয়েছে।

ইংরেজী সাহিত্যের সুপণ্ডিত বুদ্ধদেব বসু পরিণত বয়সে দেশী-বিদেশী নানা কাব্য-পুরাণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর চেতনায় একদিকে যেমন বোদলেয়ারের নিয়তিবাদ ও বিষাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি অন্যদিকে বিগত পাঁচ দশকের শিকড়হীন সাহিত্য চর্চার ধারায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। এইপর্বে শিকড়হীন সাহিত্য-ধারার বিকল্প পরিপূরক খুঁজতে তিনি যাত্রা করলেন প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে। তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে তাই তিনি মহাভারতীয় কাহিনী অনুসরণ করলেন। কারণ তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ মিথটিকে আধুনিক জীবন- জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে পুনঃসৃজিত করা। নাটকের ভূমিকা অংশে তাই তিনি লিখেছেন ঃ ''এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটি শিল্পিত-অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা। বলাবাহুল্য, এ ধরণের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।''[১]

নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর কল্পনা-সমৃদ্ধ এবং চার অঙ্কে বিভক্ত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে এরকম : দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে অঙ্গদেশের চারদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠেছে। গাঁয়ের মেয়েরা রাজদ্বারে এসে বিলাপধ্বনি তুলছে। রাজদূতেরা দেশে দেশে ঘুরে যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন পথিমধ্যে তা রহস্যজনকভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে। তাই এই দুর্দিনে রাজপুরুষেরা দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হয়েছেন। দৈবজ্ঞের নির্দেশে রাজদূতেরা রাজমন্ত্রীর কাছে নিয়ে এসেছেন রাজ্যের অভিজ্ঞ গণিকা লোলাপাঙ্গী ও তার সুন্দরী কন্যা তরঙ্গিণীকে। কারণ পরম সাহসিনী এই দ'জন গণিকা ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই তপোবন থেকে অপাপবিদ্ধ, তেজস্বী, ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে অঙ্গদেশে নিয়ে আসে। আর, ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশ করা ছাড়া অঙ্গদেশে বৃষ্টিপাতের কোন সম্ভাবনা নেই--এই হ'ল দৈবজ্ঞের নির্দেশ।

দ্বিতীয় অঙ্কে বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী নানা কৌশলে ও ছলনার আশ্রয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কামবোধ জাগিয়ে তুলে তাকে কামাতুরা অবস্থায় অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা নগরে নিয়ে আসার কাজটি সম্পন্ন করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করা মাত্রই সেখানে অলৌকিকভাবে বৃষ্টি নামল। নেপথ্যে ধ্বনিত হ'তে লাগল মেয়েদের আনন্দিত স্বর---''বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!'' এরপর ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ হ'ল এবং তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের জন্য ফাঁদ পেতে নিজেই সেই ফাঁদে আটকা পড়লেন। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন, ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে জেগে উঠল 'ইন্দ্রিয় লালসা' এবং তরঙ্গিণীর মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল 'রোমান্টিক প্রেম।' তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের নিগূঢ় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দু'জনের আত্ম-জাগরণ ঘটল; তাদের দু'জনের চোখেই ফুটে উঠল অনন্য এক স্বপ্ন। তরঙ্গিণী কেবলই সন্ধান করতে লাগলেন তার সেই মুখশ্রী- ঋষ্যশৃঙ্গ প্রথম দর্শনে যে দেবদুর্লভ মুখশ্রীর কথা তরঙ্গিণীকে বলেছিলেন। অন্যদিকে, ঋষ্যশৃঙ্গও তার বিবাহিতা পত্নীর সহবাসে কোনো তৃপ্তি পেলেন না; যুবতি তরঙ্গিণীই যে তার ঈপ্সিতা। তিনি স্বপ্নে, জাগরণে সন্ধান করতে লাগলেন তরঙ্গিণীর

সেই নারীরূপ যে নারীরূপের বিভা তাকে শুধু নারী সম্পর্কে সচেতন করে তোলে নি- তার নিজস্ব পৌরুষ সম্পর্কেও তাকে অবহিত করে তুলেছিল। নারী সংস্পর্শে পুরুষের চিত্ত জাগরণের ছবি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে : ''নারী।....নারী, নারী। নূতন নাম। নূতন রূপ,.....নূতন এক জগৎ।.....আমি অস্নাত থাকব তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে।''[২] ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী আবার এমন এক সময়ে মিলিত হলেন যখন রাজকুমারী শান্তার প্রেমিক মন্ত্রী-পুত্র অংশুমান ও তরঙ্গিণীর প্রেমিক চন্দ্রকেতু লোলাপাঙ্গীর সঙ্গে নিজেদের দাবী ও প্রার্থনা নিয়ে ভাবী যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অবশ্য, ততদিনে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে; ঋষ্যশৃঙ্গের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু ঋষ্যশৃঙ্গের পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত জীবন-কাহিনীর পরিণতিকে এভাবে যুক্ত করলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে তার কৌমার্য প্রত্যর্পণ করলেন এবং শান্তার পূর্ব-প্রেমিক অংশুমানের হাতে তাকে ও পুত্রকে অর্পণ করে দেহ সর্বস্ব ভোগ-বাসনা থেকে দেহাতীত অনুভবে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ''ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে তাহার কৌমার্য প্রত্যর্পণ করিল। প্রেমহীন বিবাহের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দিল।....এই মুক্তিদানের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের উদারতা এবং লেখকের আধুনিক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।''[৩] আর, ঋষ্যশৃঙ্গের আজ্ঞায় তরঙ্গিণীরও নিষ্ক্রমণ হ'ল একাকী। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর কথোপকথনে নাট্যকারের এই জীবন-জিজ্ঞাসার চিহ্ন খুঁজে পাই। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর কথোপকথন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

'' তরঙ্গিণী । (এগিয়ে এসে) তুমি কি আশ্রমে ফিরে যাচ্ছনা ?

ঋষ্যশৃঙ্গ । কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী।.....আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি। আমাকে সব নতুন করে ফিরে পেতে হ'বে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হ'বে, তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণী । প্রিয়, আমার প্রিয়তম, আমি কি আর কোনদিন তোমাকে দেখবো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ । আমাকে বাধা দিয়ো না, তরঙ্গিণী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে। ''

এখানে বুদ্ধদেব বসু পুরাণ চরিত্রের নবরূপায়ণ ঘটালেন। নাট্যকার নিজেই একদা জানিয়েছিলেন যে, তিনি 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা থেকে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাণের এক অনামি বারাঙ্গনার জীবনে আশ্চর্য প্রেমের জাগরণ ঘটিয়ে তাকে একজন নারীতে রূপান্তরিত করেছেন। এই কবিতায় পতিতা রাজমন্ত্রীর কাছে তার মনের তীব্র দহন ব্যক্ত করে জানিয়েছেন-

'' অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ করে
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া যে কেহ বোঝে না কভু, ''

আর বুদ্ধদেব বসু এই নারীকেই বিশেষ নাম দিয়ে তাকে ব্যক্তিত্বময়ী নারীতে রূপান্তরিত করেছেন; কামকে পরিণত করেছেন প্রেমে। তাই তাঁর বন্দিনী নারী বিধাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

''তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকারে অমারাত্রি সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।''[৪]

এই অনুরূপ অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের তরঙ্গিণীর মধ্যে।

ভারতীয় ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মিথটি মানব জীবন-বৃত্তের একটি মৌলিক সত্য। দেহ এবং দেহগত কামনা-বাসনার স্তরপরম্পরা অতিক্রম করে বুদ্ধদেব এই নাটকে রোমান্টিক প্রেমের ধারণা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, নারী-পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ ও কামনার উদ্দীপন বিশ্বমানবের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আর সেই অর্থেই প্রেমের মূল 'শিকড়' রূপে বুদ্ধদেব বসু রূপান্তরধর্মী 'কাম'-এর কথা বলেছেন। সমস্ত জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় বুদ্ধদেব বসু যে কামচেতনার সমৃদ্ধ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, সেই জীবনতৃষ্ণার প্রকাশ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর মধ্যেও ঘটেছে। নারী-পুরুষে ভেদজ্ঞানহীন ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে কামনার উদ্রেক ঘটিয়েছে তরঙ্গিণী; তার মধ্যে জেগেছে কামসম্ভূত প্রেম। যেমন, ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের কিছু অংশ :

''ঋষ্যশৃঙ্গ । (তরঙ্গিণীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ; স্বগতোক্তির ধরনে)--তুমি।
তুমি....আমার হৃদয়ের বাসনা, আমার শোণিতের হোমানল। অন্য
কেউ নয়, অন্য কিছু নয়।.....তৃষ্ণার্তের যেমন জল, তেমনি আমার
চোখের পক্ষে তুমি।''[৫]

যে-নারীর চোখে জীবনের উদ্দীপন শক্তি, তাকে ছাড়া যে আজ ঋষির জীবন ব্যর্থ; ঋষ্যশৃঙ্গকে জীবনের এই দীক্ষাই দিয়েছে তরঙ্গিণী।

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর মনে অর্ন্তদ্বন্দ্ব-মথিত প্রেম ও বিরহের কালাতীত জীবন-তৃষ্ণার রূপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে; দেহকে কেন্দ্র করেই যে দেহাতীত প্রেমের উত্তরণ ঘটানো যায়, বুদ্ধদেব বসু পাঠক ও দর্শককে তাই অনুভব করিয়েছেন মহাভারতীয় এই কাহিনীর আধুনিক রূপায়ণে। তাঁর একটি উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয় : ''লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো--নাটকটির মূল বিষয় হলো এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠল তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের হৃদয় লালসা। এই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলো 'রোমান্টিক প্রেম'- যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'-য় বর্ণিত আছে, সেভাবেই।....তরঙ্গিণী সেই আবেশ আর কাটিয়ে উঠতে পারলে না, তাই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে প্রথমে নিরাশ হলো সে ; এবারে যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উল্টে গেলো--অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ চাইলেন তরঙ্গিণীকে 'ভ্রষ্ট' করতে, আর তরঙ্গিণী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে সেই স্বর্গ-- যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন, এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় সব মানুষের চরম সার্থকতা।''[৬]

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের বিনির্মাণ করলেন। নাটকটির আরম্ভ হয়েছে গাঁয়ের মেয়েদের গান দিয়ে; দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে কাতর মানুষদের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে মেয়েরা বৃষ্টি প্রার্থনা করছে। এলিয়ট তাঁর '*The Waste Land*' কাব্যে এবং *J. L. Weston* তাঁর '*Ritual to Romance*'-এর কাহিনীর শুরুতেই এক অনুর্বর পোড়োজমিকে হাজির করেছেন; যেখানে ফসল ফলে না---বন্ধ্যা। এলিয়ট ও ওয়েস্টন প্রাচীন কাহিনীর
অবয়বে প্রতিধ্বনিত আধুনিক কালের অবক্ষয়িত যন্ত্রণাজনিত বেদনাকে নতুন ব্যঞ্জনায় প্রতীকী তাৎপর্য দান করেছেন। বুদ্ধদেব বসুও এই নাটকে বন্ধ্যাভূমির প্রেক্ষিতে আধুনিক মানুষের রিক্ত, বিচ্ছিন্ন, শূন্য অবস্থানটিকে দ্যোতিত করেছেন। গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তিনি এলিয়টের '*Murder in the Cathedral*' নাটকের 'কোরাস' সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, আদিম সমাজে বহু মিথের জন্ম হয়েছে ফসল ফলানো কিংবা ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে। ফসলের সুপ্রজননের (*fertility*) জন্য সে সমাজে নানা যাদুবিদ্যা-মূলক আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল এবং এর প্রধান অঙ্গ হিসেবে একটি পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান ঘটানো হ'তো। কারণ পুরুষের বীর্য

এবং আকাশের বৃষ্টি আদিম মানব সমাজের দৃষ্টিতে একটি পরস্পর পরিপূরক ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। পুরুষের সংস্পর্শে এসে নারী যেমন সন্তানবতী হয়ে ওঠে, তেমনি বৃষ্টিধারায় স্নাত পৃথিবীও শস্য-শ্যামলা হ'য়ে উঠবে। এই নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নাশের জন্য বারাঙ্গনাকে প্রেরণ এবং বারাঙ্গনার ছলনায় আকৃষ্ট হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশের নগরে প্রবেশ করা মাত্র বৃষ্টি-ধারায় স্নাত হ'য়ে ওঠে নগরী। এরপর রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ অনুষ্ঠান। --এই ঘটনা পরম্পরায় বুদ্ধদেব বসু আদিম সমাজের লোকাচার ও ঐতিহ্যমূলকতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সমসাময়িক আধুনিক অবক্ষয়িত জীবন থেকে উর্বরতা সম্পন্ন চিরকালীন জীবনে উত্তরণের কামনার কথাই মেয়েদের আকুল হাহাকারে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন।

আবার 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী হলেও অপরাপর চরিত্রগুলিও এখানে সমান প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। শান্তা, অংশুমান, লোলাপাঙ্গী, চন্দ্রকেতু--প্রতিটি চরিত্র যেন একে অপরের বিপ্রতীপে দাঁড়ানো জীবন সমগ্রতার এক একটি পরিপূরক সত্তা। তাই নাটকের শেষে লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুকে বলেছেন--''আমি এখনো বৃদ্ধা হই নি।'' লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর জীবনের এই ফ্রয়েডিয় পরিণতি কাম ও যৌনতায় দোলায়িত আধুনিক জীবনের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। পুরাণের কাহিনীতে অঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে রাজা লোমপাদের ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাচার এবং পুরোহিতের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে। আর, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে আধুনিকতার আবহটি অক্ষুন্ন রাখার জন্য দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে শাসক গোষ্ঠীকে দায়ী করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই, নাটকটির প্রথম অঙ্কে প্রথম দূত পাপীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করলে দ্বিতীয় দূত তাকে বলেছে : ''থামো, অতিকথন হয়ে যাচ্ছে। রাজদূতের মুখে রাজদ্রোহ কি সমীচীন?''--- মোটকথা, বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের চরিত্রগুলি জীবনের অজস্র স্রোত-প্রতিস্রোতের চলমানতাকে প্রতিবিম্বিত করেছে।

''নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই নাটকে একটি সাংকেতিক জীবন-রহস্যপূর্ণ মিথ কাহিনীর ব্যবহার করে আধুনিক সময়ের ব্যক্তিচিন্তাকে চিরকালীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে আবহমান কালের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।''[৭] এর ফলে, তাঁর চরিত্রগুলি বর্তমান থেকে দূরবর্তী অতীত কালের হয়েও আধুনিক মনস্তত্ত্ব সম্মত চিরকালীন মানব চরিত্র হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থঋণঃ

১) বসু, বুদ্ধদেব :তপস্বী ও তরঙ্গিণী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, অষ্টম মুদ্রণ, বৈশাখ১৪০৫, পৃষ্ঠা-৬।

২) প্রাগুক্ত :পৃষ্ঠা-৩৮।

৩) ঘোষ, অজিতকুমার :বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩, ২য় সংস্করণ মে ২০১০, পৃ-৪৬৬।

৪) বসু, বুদ্ধদেব :তপস্বী ও তরঙ্গিণী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, অষ্টম মুদ্রণ, বৈশাখ১৪০৫, পৃষ্ঠা-৭৫।

৫) প্রাগুক্ত :পৃষ্ঠা-৭১।

৬) প্রাগুক্ত :পৃষ্ঠা-৮৪।

৭) চক্রবর্তী, অনামিকা :'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে মিথের শিল্পরূপ : 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী পুরাণের নবভাষ্য' ডঃ অপূর্ব দে (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ মার্চ-২০১১, পৃষ্ঠা-৮৩।

গ্রন্থ তালিকাঃ

১) তপস্বী ও তরঙ্গিণী :বুদ্ধদেব বসু, আনন্দ পাবলিশার্স।

২) তপস্বী ও তরঙ্গিণী পুরাণের নবভাষ্য :ডঃ অপূর্ব দে (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৩) বাংলা নাটকের ইতিহাস :ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং।